বেলা অবেলার কথা

আউশ নিয়ে ব্রির সাম্প্রতিক কর্মকান্ড

ড. জীবন কৃষ্ণ বিশ্বাস

সারা বাংলাজুড়ে এক সময় আউশ আর আমন ধানই ছিল ধানের মধ্যে প্রধান ফসল। বোরো এলাকা সীমাবদ্ধ ছিল শুধুমাত্র হাওর এবং কিছু কিছু বিল এলাকায়। এর পরিমাণ কোনক্রমেই ১ মিলিয়ন হেক্টরের বেশি ছিল না। অথচ আউশ ছিল প্রায় ৩ মিলিয়ন এবং আমন ছিল প্রায় ৫ মিলিয়ন হেক্টর জায়গাজুড়ে।

প্রয়োজনের তাগিদেই এক সময় এৎড় িসড়ৎব ভড়ড়ফ আন্দোলন শুরু হয়। ফলে সেচ সুবিধে বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে উচ্চ ফলনশীল ধানের আবাদ বাড়তে থাকে। এজন্য হাওর এলাকার অনুকরণে অপেক্ষাকৃত উঁচু এলাকায় শীত মৌসুমে সেচ দিয়ে জমি কাদা করে ধানের আবাদ শুরু হয়। অনেকটা বোরোর মতো পৌষে রোপণ আর বৈশাখে ঘরে তোলা। আর এভাবেই সেচনির্ভর শীতের উচ্চ ফলনশীল ধান বোরো ধান বলেই পরিচিতি পায়।

আমাদের তো জমির অভাব। তাই নতুন করে জমির বন্দোবস্ত করার সুযোগ ছিল না। ফলে আউশের জমি, পাটের জমি, জায়গা বিশেষে রবি ফসলের জমিও বোরোর আওতায় চলে আসে। আউশ ও রবি ফসল চিকন (দো- অাঁশ) মাটির ফসল। এ ধরনের মাটির পানি ধরে রাখার ক্ষমতা কম। অথচ বেশি ফলনের আশায় সেচ দিয়ে এসব জমিগুলো উচ্চ ফলনশীল বোরো চাষের আওতায় আনা হয়। সেই থেকে পানির অপচয় শুরু। পানির অর্থনৈতিক বিষয়টি সে সময় বিবেচনায় আনা হয়নি। পরিবেশ নিয়ে চিন্তা- ভাবনা তো অনেক পরের বিষয়। এমনকি বেশিরভাগ বিজ্ঞানীরাও এ ধরনের চিন্তা- চেতনার বাইরে ছিলেন বলে মনে হয়। ফলে বোরোর এলাকা এক মিলিয়ন থেকে বেড়ে যায়। আউশের ওপর বোরোর এ আগ্রাসী ভূমিকা বেশ লম্বা সময় ধরে। প্রায় চার দশক। ফলে পরিবেশের ওপর আজ বিরূপ প্রভাব দেখা দিয়েছে। বোরো আবাদি এলাকায় ভূগর্ভস্থ পানির স্তর স্বাভাবিকের চেয়ে বেশ নিচে নেমে গেছে। অবস্থা এমনই যে বিজ্ঞানীরা বলছেন বর্ষাকালে স্বাভাবিক নিয়মের যে রিচার্জ (পানির স্তর আবার স্বাভাবিক অবস্থায় উঠে আসা) হওয়ার কথা সেটাও পুরোপুরি হচ্ছে না। আর এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণের জন্য সরকার অনেক কিছুু ভাবছেন। যার অন্যতম হলো পানি সাশ্রয়ী ফসলের আবাদে আবার ফিরে যাওয়া যায়। তবে এখনও বেশিরভাগ চাষিদের প্রথম পছন্দ ধান। সে ক্ষেত্রে ধান যদি করতেই হয় তাহলে আউশের আবাদে আবার ফিরে যাওয়া যায় কি না। সত্যি কথা বলতে কি বহু বছর ধরে বোরো আবাদের যে প্রবাহ, তার গতি ফিরিয়ে দেয়া কম কথা নয়। তাই বলে যে একেবারে অসম্ভব, এমন নয়। এজন্য যথাযথ প্রযুক্তির সহায়তা দরকার। তার আগে দরকার নতুন চিন্তাভাবনা এবং কর্মকৌশল ঠিক করা।

এ বিষয় নিয়ে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের (ব্রি) বিজ্ঞানীদের মধ্যে এক সময় উদ্বিগ্নতা ছিল। তখনকার নীতিনির্ধারকদের সময়োচিত পদক্ষেপের অভাবে এসব বিজ্ঞানীরা তাদের উদ্বিগ্নতাকে কাজে পরিণত করার সৎসাহস দেখাতে পারেনি। এজন্যই এ প্রতিষ্ঠানের আউশ ধান সম্পর্কিত গবেষণা কার্যক্রম এর আগে আলোর মুখ দেখতে পারেনি। যা হোক এখন আর আগের প্রেক্ষাপট নেই। সময় অনেক বদলে গেছে। আমাদের নীতিনির্ধারকদের অন্যতম ব্যক্তিরা আজ বৈজ্ঞানিক চিন্তা- চেতনায় ঋদ্ধ। তারা তাগিদ দিচ্ছেন, 'আমাদের ভাতও চাই, পরিবেশও চাই' এবং সেটা কীভাবে সম্ভব তা বিজ্ঞানীদেরই বের করতে হবে। ধানের ফলন বাড়াতে হবে আবার পরিবেশও ভালো রাখতে হবে। এজন্য ভাবনাগুলো হলো কীভাবে পানি সাশ্রয়ী ধানের প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা যায়। কীভাবে পানি সাশ্রয়ী অন্যান্য কৃষি প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা যায়। শুধু তাই না প্রযুক্তি যেন হয় ঝগঅজঞ। অর্থাৎ ঝঢ়বপরভরপ, গবধংঁৎধনষব, অঃঃধরহধনষব, জবধষরংঃরপ ধহফ ঞরসব নড়ঁহফ। ব্রি এখন সে লক্ষ্যেই 'ঝগঅজঞ প্রযুক্তি : ঝগঅজঞ সম্প্রসারণ' এই দর্শন মাথায় নিয়ে তার কার্যক্রম শুরু করেছে। এ কার্যক্রমের প্রথমেই ছিল আউশ সম্পর্কিত একটি কর্মশালা। যা আমরা গতবছর কৃষি সম্প্রসারণের সহায়তায় করেছি।

আগেই বলেছি বোরোর আওতাভুক্ত সব জমি আবার আউশে ফিরিয়ে আনা দুরূহ। এ বাস্তবতা মাথায় রেখে একটা খসড়া হিসাব কষা হয়েছে। ধরা যাক বর্তমান বোরো আবাদের ২০% অর্থাৎ ০.৮২৯ মিলিয়ন হেক্টর জমি আউশে ফিরিয়ে আনা হলো। এজন্য শুরুতেই হয়তো মোটিভেশন নয় কিছুটা চাপাচাপির (প্রেসক্রিপশন) দরকার হতে পারে। তাহলে আউশের অধীন বর্তমান জমি ও বোরো থেকে ফিরে পাওয়া জমি সহ মোট জমির পরিমাণ দাঁড়াবে ১.৮৫ মিলিয়ন হেক্টর। ফলে আমাদের হিসাব মতে বোরোর মোট উৎপাদন ৩.১৮ মিলিয়ন টন (এখানে সব উৎপাদন বা ফলন চালের হিসাবে দেখানো হয়েছে) কমে যাবে। এখন আধুনিক আউশের ফলন ২.০২ টন বা কিছুটা বেশি। বোরোর ঘাটতি মেটাতে হলে আউশের হেক্টর প্রতিফলন এখান থেকে বাড়িয়ে ২.৮৩ টন করতে হবে। এভাবে আউশের মোট উৎপাদন দাঁড়াবে ৫.২৫ মিলিয়ন টন বা তারও কিছু বেশি। এ অবস্থায় বোরো থেকে আউশে গেলেও দেশে চালের ঘাটতি হবে না। স্বাভাবিক পাটিগণিতের ধারায় এ হিসাবটি করা। পাশাপাশি কম্পিউটারভিত্তিক সিমুলেশন স্টাডিও আমাদের করা আছে। এখানে অবশ্য বোরো থেকে আউশে স্থানান্তরের হার ধরা হয়েছে ১৫%। এ ধারায় চলতে থাকলে ২০২০ সাল নাগাদ আউশ আবাদি জমির পরিমাণ দাঁড়াবে ২ মিলিয়ন হেক্টর যা ২০৩০ সাল নাগাদ কিছুটা কমে ১.৫৬ মিলিয়ন হেক্টরে দাঁড়াবে। এ কমে যাওয়াটা সম্ভবত জলবায়ুর কারণে হতে পারে। যা হোক হিসাবে মতে, ২০২০ ও ২০৩০ সালে আধুনিক আউশের প্রক্ষেপিত হেক্টরপ্রতি ফলন হবে যথাক্রমে ২.৭২ ও ৩.২০ টন। ধান উৎপাদনের ওপর জলবায়ুর পরিবর্তনের প্রভাব ও বাজারমূল্য বিবেচনায় রেখে দেখা যায়, ২০৩০ সাল নাগাদ মোট চালের উৎপাদন হবে ৪৭ মিলিয়ন টন। অপরদিকে ২০৩০ সালে ১৯০ মিলিয়ন লোকের খাদ্য চাহিদা মেটাতে মাত্র ২৮ মিলিয়ন টন চাল তথা ৪২ মিলিয়ন টন ধানের প্রয়োজন হবে। এ হিসাবে খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তনের বিষয়টি বিবেচনায় রাখা হয়েছে এবং এ হিসাব অনুযায়ী ২০৩০ সাল নাগাদ ১৯ মিলিয়ন টন চাল উদ্বৃত্ত হবে। ফলে দেশের অভ্যন্তরীণ মজুদের চাহিদা মিটিয়ে বহির্বিশ্বে বেশকিছু চাল রফতানি করা যাবে। যা হোক শুধু বোরোর কিছু জমি আউশে পরিবর্তনই শেষ কথা নয়। পাশাপাশি ব্রি যা করছে_

* প্রতি দিনে তুলনামূলক বেশি ফলন দিতে পারে এমন ধরনের উফশী- ইনব্রেড ও উফশী- হাইব্রিড জাত উদ্ভাবন
* বৈরী পরিবেশে অভিযোজন উপযোগী জাত ও আবাদ প্রযুক্তি উদ্ভাবন

* আগাছাসহ অন্যান্য বালাই দমনের জন্য পরিবেশবান্ধব কার্যকরী ব্যবস্থা উদ্ভাবন

* অনুকূল পরিবেশের জন্য পানি সাশ্রয়ী জাত ও আবাদ প্রযুক্তি উদ্ভাবন

* কৃষি যান্ত্রিকীকরণ সংক্রান্ত গবেষণা জোরদার ও জনপ্রিয়করণ

* প্রশিক্ষণ ও সম্প্রসারণ কার্যক্রম জোরদারকরণ

* যুগপোযুগী কৃষিবিষয়ক ডিজিটাল প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও চাষিবান্ধবকরণ

এছাড়াও আরও যা করার দরকার-

* চাষি পর্যায়ে ধানের সংরক্ষণ ব্যবস্থা চালু করা

* কৃষি বাজার ব্যবস্থাপনায় কৃষকের অংশগ্রহণের সুযোগ এবং মধ্যস্বত্বভোগীদের প্রভাব ক্ষুণ্ন করা
* ধান তথা সব কৃষিপণ্যনির্ভর শিল্প কাঠামো গড়ে তোলা
* আন্তর্জাতিক বাজারে বাংলাদেশের কৃষিপণ্য বিপণনের ব্যবস্থা গড়ে তোলা।

সরকার তার প্রণোদনা কর্মসূচির মাধ্যমে আউশ আবাদে যথেষ্ট জোর দিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে ব্রি নিজের মতো করে আউশ সংক্রান্ত কিছু কাজ হাতে নিয়েছে। ইতোমধ্যে আউশের উপযোগী বেশকিছু জাত উদ্ভাবন করেছে। সেগুলোর মধ্য থেকে এবারের নিজস্ব সম্প্রসারণ কর্মসূচিতে বোনা আউশ হিসাবে বিআর২৪, বিআর৪৩ এবং ব্রি ধান৬৫ এবং রোপা আউশ হিসাবে ব্রি ধান২৭, ব্রি ধান৪৮, ব্রি ধান৫৫ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বিনামূল্যে বীজ সহায়তা বাবদ সারাদেশে এক বিঘা করে ১১৪৬টি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়েছে। বরিশাল, পিরোজপুর, নড়াইল, রাজবাড়ী, মাগুরা, বরিশাল, মেহেরপুর, কুষ্টিয়া, ঝিনাইদহ, চুয়াডাঙ্গা, শেরপুর, নেত্রকোনা, গাজীপুর, ঝালকাঠি, পটুয়াখালী, বরগুনা, ভোলা, রংপুর, লালমনিরহাট, কুড়িগ্রাম, নীলফামারী, গাইবান্ধা, বান্দরবন, সাতক্ষীরা, কুমিল্লা, ফেনী, হবিগঞ্জ, রাজশাহী, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, কঙ্াজার, রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি, ফরিদপুর জেলায় প্রদর্শনী করা হয়েছে। আশা করা যাচ্ছে যে, এসব প্রদর্শনী থেকে ব্রির তত্ত্বাবধানে চাষিরা ৬৬৬ টন বীজ উৎপাদন করতে পারবে। এর মধ্যে ব্রি ধান৪৮- এর বীজের পরিমাণ হবে সবচেয়ে বেশি (৫৭৪ টন)। এর পরেই থাকছে ব্রি ধান৪৩ (৩৪ টন) এবং ব্রি ধান৫৫ (২৬ টন)। নতুন জাত ব্রি ধান৬৫ এর লক্ষ্যমাত্র হলো ৫.৩৬ টন। এ বীজের কিছু পরিমাণ মাত্র চাষিরা সংরক্ষণ করবে। বাকিটা তারা খেয়ে ফেলবে। সংরক্ষিত বীজের মধ্যে ব্রি ধান৪৮ এর পরিমাণ হবে ১৩২ টন। ব্রি ধান২৭ এবং ব্রি ধান৪৩ প্রতি জাত ৫ টন করে সংরক্ষণ করতে পারবে। এ সংরক্ষিত বীজ থেকে পরের বছর আউশের আবাদি এলাকার পরিমাণ দঁড়াাবে ৩৮৩৪ হেক্টর। তার পরের বছর সংরক্ষিত বীজের পরিমাণ বাড়বে। সেই সঙ্গে আউশের আবাদি আওতা কিছুটা বাড়বে। তারপরের বছর হয়তো আরও কিছুটা বাড়বে। এভাবে আউশ সম্প্রসারণে ব্রির প্রচেষ্টা চলতেই থাকবে।

এবারে ব্রির সাম্প্রতিকতম আউশের গবেষণার কিছু বিষয় আমি তুলে ধরতে চাই। আউশের জন্য প্রজনন পর্যায়ে উচ্চ তাপসহনশীলতা একটি জরুরি প্রপঞ্চ। এমনকি নাবি বোরো বা ব্রাউশের জন্যও বৈশিষ্ট্যটি দরকার। ব্রির বিজ্ঞানীরা জলি আমনের জাত হাসফল বোরোন, মোল্লাদীঘা এবং আবছায়ার মধ্যে উচ্চ তাপ সহনশীলতার বৈশিষ্ট্য খুঁজে পেয়েছে। এছাড়া বহুল আলোচিত সিলেটের আউশ ধান কাচালত (ফসফরাস- টলারেন্ট) এবং উন্নত দেশি জাতের আউশ ধান দুলার উচ্চ তাপসহনশীল। এখন বিজ্ঞানীরা চেষ্টা করছেন এ জাতগুলো ব্যবহার করে উচ্চ তাপসহনশীল আধুনিক আউশ এবং বোরোর জাত উদ্ভাবন করতে। ইতোমধ্যে ভারতীয় উচ্চ তাপসহনশীল জাত ঘ২২ থেকে মেজর- ইফেক্ট স্পাইকলেট ফার্টিলিটি ছঞখ য়ঝঋ৪.১এবং মাইনর- ইফেক্ট ছঞখ য়ঝঋ৪.২ মারকার অ্যাসিসটেড সিলেকশন প্রক্রিয়ায় ব্রি ধান২৮ এবং ব্রি ধান২৯ এ সংযোজন করা হয়েছে। ঘ২২এর জীবনকাল ৯০ দিন। ফলে উদ্ভূত এবং নির্বাচিত সারিরগুলোর মধ্যে বেশ কিছু সারির জীবনকাল ৯০ দিনের মধ্যে। এগুলো তাপসহনশীল হওয়ায় অবশ্যই আউশ হিসাবে উপযোগী হবে। আগামী দু'বছরের মধ্যে সারিগুলো জাত হিসাবে অবমুক্তির জন্য তৈরি করা যাবে। কাচালত, দুলার এবং অন্য তিনটির জিন ম্যাপিং বা মলিকুলার বৈশিষ্ট্য আপাতত জানা নেই। আরও উন্নত স্ক্রিনিং ফ্যাসিলিটি তৈরি করা গেলে এগুলোর বৈশিষ্ট্যায়ন ব্রিতেই এক সময় করা যাবে। যেহেতু এ জাতগুলো নিশ্চিতভাবে উচ্চতাপ সহ্য করতে পারে, তাই গতানুগতিক সঙ্করীকরণের মাধ্যমে আউশ এবং নাবি বোরোর জাত উদ্ভাবনের কাজ এগিয়ে চলেছে। একই সঙ্গে কিছুটা কম আলোতে বেশি ফটোসিনথেসিস- এ সক্ষম জাত, খরায় টিকে থেকে অনুকূল পরিবেশ পেলে প্রচুর কৃষি উৎপাদনে সক্ষম জাত বাছাইয়ের কাজ শুরু হয়েছে। কারণ ভাবিষ্যতের আধুনিক আউশে এ গুণগুলো সংযোজন করার দরকার আছে।

আমাদের আউশ ধানের কার্যক্রম এখন বেশ গতিশীল হওয়ার পথে। এর পেছনের কারণ হলো মাননীয় কৃষিমন্ত্রীমহোদয়ের তাগিদ। বিজ্ঞানীরা চেষ্টা করছেন। আমি বিশ্বাস করি, তাদের সাধ আছে কিন্তু সাধ্য ততটা নেই। তবে কাজটিতো তাদেরই করতে হবে। পরিশেষে আমি তাদের একজন হয়েই রবি ঠাকুরের ভাষায় বলছি-

কে লইবে মোর কাযর্, কহে সন্ধ্যারবি-

শুনিয়া জগৎ রহে নিরুত্তর ছবি।

মাটির প্রদীপ ছিল; সে কহিল, স্বামী,

আমার যেটুকু সাধ্য করিব তা আমি।

[লেখক : মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুর]